Vol. 29 | No. 1 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লালন-অনুসারী কবিবৃন্দ

Volume	29
Issue	1
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এস. এম. লুৎফর রহমান
Published online	October 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v29i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i1.2
Pages	21-54
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

লালন-অনুসারী কবিবৃন্দ

এস. এম. লুৎফর রহমান

সাহিত্য-ক্ষেত্রে মহৎ প্রতিভার অনুকরণ ক'রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিভা আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পায়। তা' থেকে অনুকরণীয় প্রতিভার মহত্ত্ব ও তার সমকালীন সাফল্যের পরিমাপ করা যায়। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে একটি সার্বজনীন আবেদন থাকে—যা অন্যকে আকর্ষণ করে এবং কিছুকালের জন্য তাদের আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। রবীন্দ্রানুসারী কবি-গোষ্ঠী ও নজরুল-অনুকারী কবি-বৃন্দ এর উদাহরণ। শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্মোহন শক্তি, লালন-প্রতিভার ক্ষেত্রেও দৃষ্ট হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, লালন সারা জীবন গ্রামে অতিবাহন ক'রেছেন। তাঁর সংগীতরাজিও একান্তভাবে গ্রামীণ মানুষের কণ্ঠে সীমাবদ্ধ থেকেছে। মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়নি। এজন্য লালনের মৃত্যুর বহুদিন পর পর্যন্ত শিক্ষিত শ্রেণী লালন ও তাঁর গীতাবলীর যথাযথ পরিচয় লাভে সমর্থ হয়নি। সমকালীন যে সব কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি-গত পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল, তাঁরাও তাঁকে শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে তুলে ধরার প্রয়াস পাননি এবং তার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমতাবস্থায়, লালন-প্রতিভার প্রভাব অবশ্যই সীমিত থাকা স্বাভাবিক। উক্ত সীমাবদ্ধতা কর্ষিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে সহজেই লক্ষণীয়। কিন্তু লোক-সাহিত্যে লালন-প্রতিভার সর্বৈব প্রভাব আজও অব্যাহত। ফলে, কবি হিসেবে লালনের প্রভাব লিখিত সাহিত্যে অধিক নয়, তবে লোক-সাহিত্যে, বিশেষতঃ বাউল গানে—বিপুল।

সমকালীন শিক্ষিত কবিদের রচনায় লালনের প্রভাব

উনিশ শতকে মূলতঃ দু'টি ধারায় বাঙ্‌লা কাব্যের বিকাশ ঘটে—মহাকাব্যের ধারা ও গীতি-কবিতা বা খণ্ড-কবিতার ধারা। 'বটতলার পুথি' বা 'মিশ্রভাষা রীতির কাব্য' এবং লোক-সঙ্গীতের নানা শাখাও

অবশ্য সমগ্রভাবে বাঙ্‌লা কাব্যধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। এসবের মধ্যে মহাকাব্য ও মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের কবিদের সঙ্গে লালনের তুলনা করা চলে না। একমাত্র খণ্ড-কবিতা ও লোক-সঙ্গীতের ধারায় লালন শাহের অনুরাগী ও অনুসারী কবিদের সন্ধান করা কর্তব্য। লোক-সাহিত্য ছাড়াও লিখিত সাহিত্যের খণ্ড-কাব্য ধারায় ও কোন কোন কবির ওপর লালন-গীতির সক্রিয় প্রভাব বিদ্যমান। যে সব শিক্ষিত কবির কোন-না-কোন সময়ের রচনায় লালন-গীতির ভাব-সামীপ্য লক্ষ্য করা যায়, তাদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এরূপ কয়েকজন কবির কিছু কিছু রচনার সঙ্গে লালন-গীতির সাদৃশ্য দেখানো হ'ল।

১ ঈশ্বর গুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৫৯-এ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গুপ্ত-কবির জন্ম-ভূমি ও কর্মক্ষেত্রের সাহিত্যাবেষ্টনী ছিল মূলতঃ লোকজ আবহপূর্ণ। এরূপ পরিবেশে বর্ধিত হওয়ায় গুপ্ত-কবি "অতি শৈশব হইতেই মুখে মুখে ছড়া কাটিতে পারিতেন এবং কবি ও হাফ্-আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন।"[১] পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য-জীবনে ও সাহিত্য-কর্মে, লোক-সাহিত্য-প্রীতি বিদ্যমান ছিল।

গুপ্ত-কবির রচনা অন্বেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর 'প্রার্থনা' 'তত্ত্বচিন্তা', 'নীতিকথা' ও 'ব্যঙ্গ ও রঙ্গরস', 'গীতাবলী' এবং 'বিবিধ' পর্যায়ে বিভক্ত কবিতাসমূহে লোকজ-রীতির রচনা বিদ্যমান। এসব রচনার কোন কোনটিতে লালন শাহের 'ঘর', 'আত্মদৈন্য', 'গুরু', 'পাখী', 'ভক্তি', 'সাধন', 'ভজন' প্রভৃতি বাউলতত্ত্ব-স্পর্শী গানের প্রভাব দেখা যায়। গুপ্ত-কবির আলোচ্য পর্যায়ের রচনার মধ্যে 'দেহঘর', 'মনের মানুষ', 'মন মিশনরি' প্রভৃতি কবিতায় লালনীয় বাউল ভাবের স্পষ্ট প্রকাশ বর্তমান।

উদাহরণ স্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'তত্ত্বচিন্তা' পর্যায়ের 'দেহ-ঘর' কবিতার নিম্নোক্ত অংশের সঙ্গে লালন-গীতির তুলনা লক্ষণীয়। গুপ্ত-কবি লিখেছেন—

পাঁচের বাঁধনি এই নবদ্বার বাস।
এতদিন যাহে আমি করিলাম বাস॥...

কালের বরষা ইথে ভরসা কি আছে।
খুঁটি খসা কাঁচা ঘর কেমনেতে বাঁচে॥···
পবন পেছন থেকে মারিতেছে টেকা।
বংশহারা হ'তে হ'ল থাকে নাকো ঠেকা॥
যে বংশের ঘর এই সে বংশ কি রয়।
ঘুণ ধরে একে একে হ'য়ে গেল ক্ষয়॥[২]

আর লালনের বক্তব্য—

পাখী কখন জানি উড়ে যায়
বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়॥

খাঁচার আড়া প'লো খ'সে
পাখী আর দাঁড়াবে কিসে
ঐ ভাবনা ভাবছি বসে
চমক জরা বইছে গায়॥

মণি তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোন দিন খাঁচা প'ড়বে খ'সে
লালন ফকীর কেঁদে কয়॥

গুপ্ত-কবির আলোচ্য পর্যায়ের 'সার-উপদেশ'-শীর্ষক কবিতায় বলা হ'য়েছে—

তৃষ্ণায় যদ্যপি যায় চাতকের প্রাণ।
তথাচ মহীর নীর নাহি করে পান॥
চকোরের যদি হয় অতিশয় ক্ষুধা।
চিত্ত-সুখে খায় শুধু চারু-চন্দ্র সুধা॥[৩]

আলোচ্য কবিতাংশের সঙ্গে লালনের "চাতক স্বভাব না হ'লো"-গানটির কাব্যগত সাধর্ম্য দৃষ্ট হয়। উক্ত কবিতায় সাধকের নিষ্ঠার চিত্র অংকন করতে লালন বলেছেন—

চাতক পাখীর এমনি ধারা
তৃষ্ণায় যদি যায় গো মারা

অন্য বারি ছোঁয় না তারা
মেঘের জল বিনে।...

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের 'মন-মিশনরি'-তে বলা হ'য়েছে—

ভক্তির অধীন বিভু যুক্তি এই সার॥
জাতি ধর্ম্ম পাত্র ভেদ কিছু নাই তায়।
যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে সে ভাবে সে পায়॥[৪]

এর সঙ্গে লালন শাহের "ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই" গানটির ভাব-সাযুজ্য বিদ্যমান। যথা,—

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে তাঁর কাছে
জাতির বিচার নাই॥

গুপ্ত-কবির 'গীতাবলী'তেও লালন-গীতির প্রভাব স্পষ্ট। তিনি একটি কবিতায় লিখেছেন—

মনে যার থাকে নিষ্ঠে, কি তার চন্দন বিষ্ঠে,
এ শুচি, এ অশুচি কি সে করে বিচার॥
ভিতরেতে ভরা মল, মল নহে নিরমল,
বাহিরে ঢালিয়ে জল কর পরিষ্কার॥[৫]

আলোচ্যাংশে লালনের 'সংস্কার'-বিষয়ক গানের ভাব-নৈকট্য লক্ষণীয়। বাউল-কবি তাঁর "না পাকে পাক হয় কেমনে" গানটিতে বলেছেন—

ভিতরে না পাকের থলি
বাইরে জল ঢালাঢালি
লালন বলে মন মুসাল্লি
ভেবে দেখ মনে॥

লালন-গীতির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার এরূপ ভাব-সাযুজ্য দেখে বলা যায়, গুপ্ত-কবি লালন-গীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য অন্যান্য বাউল গানের সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় ছিল না—তা' নয়। তবে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ বাউল কবির রচনাতেই তাঁর মুগ্ধ হবার কথা।

কিন্তু উভয় কবির রচনার তুলনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, লালনের মত বিষয়নিষ্ঠা, তত্ত্ব-চিন্তা ও কল্পনার গভীরতা ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত তত্ত্বমূলক বিষয়ের অন্তর্নিহিত রূপসী রূপকে অবলোকন করতে পারেননি। কেননা, তিনি ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত—জনপদবাসী—শহুরে সাংবাদিক- কবি। আর লালনের মত সহজ স্বচ্ছন্দ কবি-প্রতিভাও তাঁর কর্মক্ষেত্রেই প্রকাশ লাভ করেছে। ফলে তিনি লোক-সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুকারী, অনুসারী, অনুরাগী, সংগ্রাহক, রক্ষক এবং পাঠক মাত্র—মহৎ স্রষ্টা নন।

২ বিহারীলাল চক্রবর্তী

বিহারী লাল চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে; তাঁর মৃত্যুকাল—১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঈশ্বর গুপ্তের মতই লোক-সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়-সূত্রে বিহারীলালেরও কবি-জীবনের সূচনা।[৬] বাউল গানের সঙ্গে আলোচ্য কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়—তাঁর রচনা থেকেই লভ্য। হয়তো লালন-গীতির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে থাকতে পারে। এরূপ অনুমানের কারণ বিহারীলালের 'বাউল-বিংশতি' কাব্য-পুস্তিকা। উক্ত রচনার কুড়িটি গানের অধিকাংশই কবিগানের ঢংএ রচিত হ'লেও কবি সেগুলোকে বলেছেন—বাউল গান। তাই পুস্তিকার নাম—'বাউল-বিংশতি'।

আলোচ্য পুস্তিকার কোন কোন গানের অংশ-বিশেষের সঙ্গে লালন-গীতির ভাব-সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিহারীলাল একটি গানে লিখেছেন—

আর বাঁচিনে,
সে বিনে আর বাঁচিনে!
আমি যে কুলবালা একি জ্বালা,
জ্বলতে হ'ল রাত্রি দিনে!
আমার দিবানিশি প্রাণ উদাসী, কাঁদিয়ে আকুল,
সেজন ডুমুরের ফুল;
দেখি তার রূপ রাশি, মধুর হাসি—
জানিনে কোথায় থেকে বাজায় বীণে॥[৭]

'মনের মানুষ' রূপ প্রেমাস্পদের নিকট, নারী হ'য়ে লালনের গানেও এমনি অধীরতা ও আকুলতার প্রকাশ বিদ্যমান। যথা,—

আছি হুতাশ হালে রে।
ও চরণ পাবো ব'লে॥
তোর প্রেমে ম'জে আমি
কুলাঙ্গার করিলাম স্বামী
কুটিলা কাল ননদিনী
দিচ্ছে জ্বালা কপট ব'লে॥

(যদি) দাসখতে নাম লিখে থাকো
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো
মানভঙ্গ দাও গোলক নাথ(ও)
প্রেমানলে অঙ্গ গো জ্বলে॥

হায় রে কেন এ দুর্দশা
না পুরিল শ্যামের আশা
লালন কয় তাই নাই ভরসা
প্রেমানলে অঙ্গ গো জ্বলে ॥

এছাড়া লালনের "ওসে কাছে থাকে দেখা দেয় না" গানটির সঙ্গেও বিহারীলালের পূর্বোক্ত গানের ভাব-সাদৃশ্য বিদ্যমান।

'বাউল-বিংশতি' ব্যতীত বিহারীলালের 'সঙ্গীত-শতক'-এর কোন কোন গানের সঙ্গেও লালন-গীতির ভাব-সামীপ্য অনুভব্য। যথা,—

এ জগতে চেয়ে দেখি
কেহ নাই আমার।
বন্ধুতা, মিত্রতা, প্রেম,
সকলি যে ফক্কিকার।

কোথায় দাঁড়াই বল,
চাদ্দিকে জ্বলে অনল,
কি করিব কোথা যাব,
খেদে করি হাহাকার॥[৮]

উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে লালন শাহের নিম্নোক্ত কবিতাটি তুলনীয়—

তুমি কার আজ কেবা তোমার
এ সংসারে।
মিছে মায়ায় মজিয়ে মন
কি করো রে॥...

সময়ে সকলি সখা
অসময়ে কেউ না দেয় দেখা
যার পাপ সে ভোগে একা
চার যুগে রে॥

আপনি যখন নও আপনার
কারে বল আমার আমার
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার
জ্ঞান নাহি রে॥

লালন শাহের এরূপ কতিপয় গানের সঙ্গে বিহারীলাল চক্রবর্তীর পূর্বোক্ত কবিতার ভাব-সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

উভয় কবির সমজাতীয় কবিতার পারস্পরিক তুলনা করলে দেখা যায়,—ভাব-প্রকাশ, ভাষা-চয়ন ও কাব্যগুণে বিহারীলালের রচনা অপেক্ষা লালনের রচনা অধিকতর প্রীতিকর।

৩ কাঙ্গাল হরিনাথ

১২৪০ বঙ্গাব্দে কাঙ্গাল হরিনাথ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে জন্মলাভ করেন।[৯] তার আঠারো বছর পূর্ব থেকে লালন কুমারখালীর অদূরে সেঁউড়িয়ায় আখড়া নির্মাণ করে বাউল ধর্ম প্রচার ও বাউল গান গেয়ে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে থাকেন।[১০] প্রাপ্ত বয়সে হরিনাথ এ আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতে পারেননি।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী তাঁর একটি লীলাবক্তৃতায় বলেছেন—"লালনের একটি বিশাল প্রতিভা ছিল। তাঁহারই অনুরাগী কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (ফিকির চাঁদ বাউল)। হরিনাথের অনুরাগীরা বাউল না

হইলেও সবাই কৃতি।"[১১] কাঙ্গাল হরিনাথ লালনের শুধু অনুরাগী ছিলেন না ,তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গতাও ছিল। হরিনাথ ১২৮৭ সালের গ্রীষ্মকালে লালন-গীতির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়েই বিখ্যাত 'ফিকির চাঁদ ফকীরের গানের দল' গঠন করেন।[১২] দল গঠনের পূর্ব থেকেই হরিনাথ ও লালনের মধ্যে হৃদ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উভয়ে পরস্পরের বাসস্থানে যাতায়াত করতেন। দল গঠনের পরও কাঙ্গাল স্বীয় রচনা পরিমার্জনার জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত হ'তেন। বসন্তকুমার পাল তাঁর 'লালন-জীবনী'তে লিখেছেন কাঙ্গাল হরিনাথ এক দিন লালন ফকীরকে স্বরচিত কতকগুলো গান শুনিয়ে জিজ্ঞেস করেন—"ভাই আমার এ কথাগুলি তোমার কেমন লাগিল?" ফকির হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তোমার এ ব্যঞ্জন বেশ হইয়াছে, তবে নূনে কিছু কম আছে (অর্থাৎ ভাষা কিঞ্চিৎ নীরস হইয়াছে)…।"[১৩]

সমকালীন যুগ ও সমাজ-সচেতনতা, ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব, অনুরাগী নব্য শিক্ষিত একদল যুবক বেষ্টিত পরিবেশ প্রভৃতির জন্য কাঙ্গাল হরিনাথ লালন-শিষ্য ও লালন-অনুরাগী ফিকির চাঁদ ফকীর হ'য়েও পুরোপুরি বাউল হ'তে পারেননি। তিনি ছিলেন 'সখের বাউল'। লালন শাহ্ ফকীরের সঙ্গে সখ্যের জন্যই তাঁর জীবনে বাউল-তত্ত্ব, বাউল গান ও বাউলদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এজন্য মুনীর চৌধুরী যথার্থই বলেছেন—"কাঙ্গাল হরিনাথের জীবন-চেতনা বরাবর এক তালে চলেনি, লালন ফকির এসে তার মূলে মোচড় দিয়ে গেছেন।"[১৪]

কাঙ্গাল নিজে যে সব বাউল গান রচনা করেছেন—তার অধিকাংশে তাই, লালন-গীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। যথা,—

এত ভালবাস থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নারি,
(তোমায়) দু'টি হাত বাড়ালে।…

৪। তোমার দয়ায় সকল পেলাম,
কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম, হায় রে,—
তুমি কোথায় থাক, কেন এসে,
আমি কাঁদলে কর কোলে।…

৬। ও নাথ, দেখা নাহি দিয়ে আমায়,
এই ইচ্ছা যদি ছিল তোমার, হায় রে;—
ওগো তবে কেন শাকের ক্ষেত,
তুমি দেখালে কাঙ্গালে।[১৫]

কাঙ্গালের এই গানটি যে, লালনের সুবিখ্যাত "আমি একদিনও না দেখিলাম তারে" গানটির আগাগোড়া অক্ষম অনুকরণ, তা' দু'টি রচনা তুলনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। যথা,—লালনের উক্তি—

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আর্শী নগর
সেথায় এক পড়শী বসত করে॥...
সেই পড়্শী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম-যাতনা সকল যেত দূরে
আবার সে আর লালন এক খানে রয় রে
তবু লক্ষ্য যোজন ফাঁকে রে॥

এছাড়া আরও তুলনীয় :

কাঙ্গাল হরিনাথের—

আমি ব'লে করে বড়াই সবে মনে।
আমি যে কি, তা কি আমি জানে।

১। আমি কর্ম্ম করি ভাই, আমি আনি খাই,
আমি চলে বেড়াই সর্বস্থানে;
আবার জিজ্ঞাসিলে আমি, আমি বলি আমি,
বেঁচে আছি আমি প্রাণে প্রাণে।...

২। ওরে, আমি দুঃখ সই, আমি সুখী হই,
আমি কথা কই আমি জ্ঞানে;
একি চমৎকার ধাঁধাঁ, আমি নিজে আঁধা,
আমি কিন্তু ভাই, আমি দেখি নে।[১৬]

আর লালন শাহের রচনা—

আমি কে তাই জানলে সাধন সিদ্ধ হয়।
আমি কথার অর্থ ভারি
আমাতে আর আমি নাই॥

অনন্ত রূপ শহর বাজারে
আমি আমি শব্দ করে
আমি কে চিনিনি তারে
বেদ পড়ি পাগলের প্রায়।··· ইত্যাদি।

লালনের এ-গানেরই প্রভাব কাঙ্গাল হরিনাথের "ও তুমি কি খেলা খলিছ ভবে" গানটিতেও বিদ্যমান।[১৭]

কাঙ্গাল হরিনাথের আরও অনেক গানে লালন-গীতির বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ কাঙ্গালের "সেই প্রেম রতন কি সহজে মিলয়," "সবে হচ্চে পার যাচ্চে এক খেয়ায়," প্রভৃতি গানের সঙ্গে লালনের "সে প্রেম সবাই কি জানে", "সবে বলে লালন ফকীর হিন্দু কি যবন" প্রভৃতি গান তুলনীয়।

এরূপে কাঙ্গাল হরিনাথ শহরে সাহিত্যের রস-পিপাসু, সংবাদ-পত্রসেবী ও আধুনিক জীবনের অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও, তত্ত্ব-চিন্তায় ও গীত-রচনায় ছিলেন গুরু লালনশাহের অনুসারী। তাঁর বিশিষ্ট দর্শন-চিন্তা "ব্রহ্মাণ্ড বেদ"[১৮] মূলতঃ কোন মৌলিক রচনা ও ভাবনা নয়, তা' লালন শাহেরই তত্ত্ব ব্যাখ্যান। কাঙ্গাল প্রতীচ্যের শিক্ষা লাভ করেননি, কিন্তু প্রতীচ্য-জীবন-চেতনার প্রভাব তাঁর উপর সক্রিয় ছিল; আর সেই সঙ্গে ছিল প্রাচ্য কবি-সুলভ তত্ত্ব-চেতনা। তাঁর এ মানসপ্রবণতা সৃষ্টির মূলে লালনের অবদান অসামান্য। বস্তুতঃ বাউল কবি কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ ফকীর যে লালনেরই সৃষ্টি—তা' হরিনাথের প্রচুর গানের উপর লালন-গীতির তত্ত্ব এবং প্রকাশভঙ্গীগত প্রভাব থেকে বোঝা যায়।

৪ মীর মোশাররফ হোসেন

মীর মোশাররফ হোসেনের জন্ম ১৮৪৭ সালে, কুমারখালীর নিকট----লাহিনী পাড়ায়। তিনি ছিলেন কাঙ্গাল হরিনাথের অনুরাগী

ও সাহিত্য-শিষ্য। সেই সূত্রে লালন শাহ্ ফকীরের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা যায়। তিনি 'ফিকির চাঁদে'র বাউল দলকে গান গাইবার জন্য তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে দলের নিয়ম অনুযায়ী যে বাউল গান রচনা করেন, তা তাঁর উপর বাউল প্রভাবের বিশিষ্ট নিদর্শন। বাউল গানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় না থাকলে মীর মোশাররফ হোসেনের পক্ষে হঠাৎ এরূপ গান রচনা সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ। গানটি এরূপ—

রবে না চিরদিন, সুদিন কুদিন
এক দিন দিনের সন্ধা হবে॥

১। এই যে আমার আমার সব ফক্কিকার
কেবল তোমার নামটি রবে।
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোনার অঙ্গ,
ধুলায় গড়াগড়ি যাবে।...

৪। তোমার যে টাকাকড়ি, ঘর বাড়ী,
ঘড়ি গাড়ী প'ড়ে রবে,
আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে,
পরের কাঁধে যেতে হবে।[১৭]...ইত্যাদি

এর সঙ্গে লালনের নিম্নোক্ত গানটির সাধর্ম্য সহজেই লক্ষণীয়:

মনের মত মন হলনা একদিনে।
আমি আছি কোথায় যাব কোথায় কার সনে॥

আমার বাড়ী আমার ঘর
বলা কেবল ঝকমারি সার
পলকে সব হবে সংহার
কোন দিনে॥
পাকা দালান কোঠা দিব
মহাসুখে বাস করিব
ভাবলাম না যে কখন যাব
শ্মশানে॥...

কিছু পরিবর্তন সহ মীর মোশাররফ হোসেনের পূর্বোক্ত গানটি তাঁর 'সঙ্গীত-লহরী' গীতি-গ্রন্থে সংকলিত হয় এবং এ গানের সঙ্গে লালনের "মন তুমি কিসের গৌরব করছ ভবে' গানটিরও ভাব-সামীপ্য বিদ্যমান।

মীর মোশাররফ হোসেনের নিম্নোক্ত গানটিও লালন-গীতির ভাব, ভাষা ও বক্তব্যস্নাত। যথা—

আরে ভাই না পাই দিশে কলির শেষে
কিসে কার মন মজেছে।...
ছেলে বুড়োয় সং সাজিয়ে
রং মাখিয়ে গান ধরেছে।
তারা বানিয়ে জটা লাগিয়ে আঁঠা
দাঁড়ি গোঁপে খুব সেজেছে॥[২০]

এর সঙ্গে লালন শাহের নিম্নোদ্ধৃত গানটির ভাব-সাযুজ্য প্রকট।

আজগোবি বৈরাগ্য লীলা দেখতে পাই
হাত বানানো চুল দাঁড়ি জট
কোন্ ভাবুকের ভাব রে ভাই।।...
না জানি এই কলির শেষে
আর কত রং উঠবে দেশে
লালন ভেঁড়োর দিন গিয়েছে
যে বাঁচ সে দেখ ভাই॥

অনুরূপ ভাবে মোশাররফ হোসেনের "মিছে ভাই জাতির বিচার আচার ব্যভিচার"-এর সঙ্গে লালনের 'জাতি-বিচার' বিষয়ক গানের সাযুজ্য লক্ষণীয়।

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মলাভ করেন। তখন লালন ফকীরের বয়স ৮৯ বছর। লালন শাহের মৃত্যু হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু লালন-রবীন্দ্র সাক্ষাৎ ঘটেনি।[২১] লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাক্যালাপের সুযোগ না হ'লেও লালন-গীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের সম্যক পরিচয়

থাকায় ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন—'লালন-গীতির ভাবধারার সঙ্গে কবিগুরুর পরিচয় ছিল।'"[২২]

বস্তুতঃ লালন-গীতি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মননে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, ধর্ম ও দর্শন চিন্তায় তো বটেই, এমন কি কাব্য ও সঙ্গীতের প্রকরণের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

উদাহরণতঃ রবীন্দ্রনাথের "স্বরূপ তাঁর কে জানে" ব্রহ্মসংগীতের উল্লেখ করা যায়। উক্ত গানে বলা হয়েছে—

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল
অযুত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে॥
তিনি নিজে অনুপম মহিমা মাঝে নিলীন—
সন্ধান তাঁর কে করে, নিষ্ফল বেদ-বেদান্ত॥
পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ, অতি মহান—
তিনি আদি কারণ, তিনি বর্ণন অতীত॥[২৩]

স্রষ্টা সম্পর্কে এমন উক্তি লালন-গীতিতেও বিদ্যমান। যথা—

পাবে সামান্যে কি তাঁর দেখা।
যার বেদে নাই রূপ রেখা?॥

কেননা, লালনের মতে—"স্বরূপে রূপ আছে গিল্টি করা"। সেই 'স্বরূপ রূপ'—'অবাঙ্‌মনসগোচর।' তার সন্ধান দিতে "ভাষা বাক্যে নাহি পারে।" কারণ—"অনামক অচিনায় কখন / বাগীন্দ্রিয় না সম্ভবে।" তিনি "অনাদির আদি"—অবর্ণনীয়।

রবীন্দ্রনাথের "স্বামী তুমি এসো আজ অন্ধকার হৃদয় মাঝে" গানের সঙ্গেও লালনের "বিষয় বিষে চঞ্চলা মন দিবারজনী" গানটি তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ উক্ত গানের শেষাংশে লিখেছেন—

ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় শ্রম—
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বার বার।
সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রু বারি বহে,
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ-বিকারে॥[২৪]

আর লালন গীতিতে বলা হ'য়েছে—

বিষয় বিষে চঞ্চলা মন দিবারজনী
মন তো বোঝালে বোঝে না ধর্ম কাহিনী॥

বিষয় ছাড়িয়ে কবে
মন আমার শান্ত হবে
আমি কবে সে চরণ
করিব স্মরণ
যাতে শীতল হবে তাপিত প্রাণী ॥...

রবীন্দ্রনাথের 'পূজা ও প্রার্থনা' পর্যায়ের গানের মধ্যেও লালন-গীতির প্রভাব লক্ষণীয়। যথা,—

তারো তারো হরি দীনজনে।
ডাকো তোমার পথে, করুণাময় পূজন সাধনহীন জনে॥
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ—
মরণ মাঝারে শরণ দাওহে, রাখো এ দুর্বল ক্ষীণ জনে॥
... ...
দিক হারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হ'তে দূরে সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল পুরে—অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে॥[২৫]

উদ্ধৃত গানের সঙ্গে নিম্নোক্ত লালনগীতি তুলনীয়—

ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ
কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে।
তুমি যা কর তাই করতে পারো
তোমা বিনে পাপী তারণ কে করে॥

না বুঝে পাপ সাগরে ডুবে খাবি খাই।
শেষ কালে তোমার দিলাম গো দোহাই
এবার আমায় যদি না তরাও গো সাঁই
তোমার দয়াল নামের দোষ রবে গো সংসারে॥
... ...

অথই তরঙ্গে আতঙ্কে মরি
কোথায় হে অপারের কাণ্ডারী
অধীন লালন বলে ত্বরায় হে তারি
নামের মহিমা জানাও সংসারে ॥

রবীন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের অনেক গানের উপর লালনের "পার কর দয়াল আমায় কেশে ধরে," "ক্ষম ক্ষম অপরাধ দাসীর পানে", "কোথা রইলে হে দয়াল কাণ্ডারী" প্রভৃতি গানের প্রভাব বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের এধরনের গান— "কোথা আছ প্রভু এসেছি দীনহীন," "আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন", "বড় আশা ক'রে এসেছি গো," "হরি, তোমায় ডাকি, সংসারের একাকী", "আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে/ পদে পদে পথ ভুলি হে" প্রভৃতি। এসব গানের ভাব, কথা ও সুর যে কতটা লালন-গীতির রঙে রঙিন, তা' উত্তরা দেবী গীত রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত গানটি শ্রবণ করলে বোঝা যায়:

দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলাম আর পেলাম না॥
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে ফিরিতেছি পাগল হ'য়ে
হৃদয়ে জ্বলছে আগুন আর নেভে না॥
পথিক কয় ভেবো না রে ডুবে যা রূপ সাগরে
নিরলে বসে কর রূপ সাধনা ॥
আবার ধরতে গেলে মনের মানুষ
ছেড়ে যেতে আর দিও না॥[২৬]

উদ্ধৃত গানটি যে লালনের সুবিখ্যাত "কথা কয় রে দেখা দেয় না" গানটির আধারে বিরচিত---তাতে সন্দেহ নেই। কবি-গুরু স্বয়ং তাঁর এ জাতীয় রচনাকে বলেছেন---"সে গুলো স্পষ্টতর রবীন্দ্র বাউলের রচনা।"[২৭]

শুধু গানের ক্ষেত্রে নয়, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতা এবং 'মানব-সত্য', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি বিশিষ্ট দার্শনিক রচনাতেও লালন-গীতির ভাবমূর্তির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান।[২৮]

তাছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যে লালন-গীতির উদার মানব-প্রীতি, জীবন-পিপাসা, মর্ত-মুখীনতা, সমাজ-দরদ, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতিও পক্ষবিস্তার করেছে। এমন কি দেশ-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে রাবীন্দ্রিক আন্তর্জাতিকতা-বাদের নিদর্শনও লালন-গীতিতেই সুপরিস্ফুট। বস্তুতঃ সেকারণেই লালন-গীতির প্রতি বিপুল অনুরাগ বশে ও বাউলদের সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বলেছেন—

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পেঁছিল না।
পূজারি হাসি মুখে মন্দির থেকে বাহির
হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, "দেখে এলে তোমার দেবতাকে?"
আমি বলি "না"।
প্রশ্ন করে, "কোন জাত নেই বুঝি তোমার?"
আমি বলি, "না"।[২৯]

এ স্বর রবীন্দ্রনাথের নয়, লালনেরই। লালন-গীতিতেই এ ধ্বনির আদি উচ্চারণ।

কখনও কখনও শুধু ভাব রূপায়ণ ও বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নয়, কায়া-গঠনেও রবীন্দ্র-রচনায় লালন-গীতির প্রভাব স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি', 'গীতি-মাল্য' প্রভৃতি সংগীতগ্রন্থের বহু রচনায় লালন-গীতির কাঠামো অনুসরণ করেছেন। জসীম উদ্দীন ১৯৬১ সালের ২রা জানুয়ারী বোম্বাইয়ে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় বলেন—"গীতাঞ্জলি হইতে গান রচনায় কবি আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের ছকে অধিকাংশ গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহা তিনি বাউলদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাউলদের গানের ছকে সঞ্চারী থাকে না। ইহা তিনি যোগ করিয়াছেন।"[৩০] অবশ্য শুধু আস্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের ছকেও অনেক গান রবীন্দ্র-রচনায় বিদ্যমান।

জসীম উদ্দীন রবীন্দ্র-সংগীতের রচনাদর্শ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লালন-নির্বিশেষ বাউল গানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লালন-গীতি সংগ্রহ[৩১], প্রকাশ[৩২], আলোচনা[৩৩] এবং তার ছন্দানুসরণ[৩৪] ও প্রশংসার কথা স্মরণ রেখে বলা যায়—রবীন্দ্রনাথের বাউল-গান-মুগ্ধতা ছিল মূলতঃ লালন-গীতি-প্রীতিজাত। এ হিসেবে শুধু আঙ্গিক, সুর, ছন্দ ও ভাবের ক্ষেত্রে নয়, কথা ও সুরের মেলবন্ধনের ক্ষেত্রেও কোন কোন রবীন্দ্র-সংগীত লালন-গীতির আলোকে প্রভাময়। সে বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে।"[৩৫] এ উক্তি যে যথার্থ তা রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরের গানগুলো শুনলে বোঝা যায়, এবং আরও বোঝা যায় যে, ঐ সব সুরের মূলে 'লালন-সাঁই-সুর' কি গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও লালন শাহের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান। উভয়-কবির-ই ভাবলোক ও রস-লোক ভিন্ন। কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি-দার্শনিক, আর লালন দার্শনিক-কবি। রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী এবং লালন প্রাচীন ধারার বস্তুবাদী। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রধান, পক্ষান্তরে লালন-গীতিকায় প্রধান ভক্তি-তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা—মানব-জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত, ভাবনা-চিন্তা ও বিকাশ-বিন্যাসের সঙ্গে সংযুক্ত, কিন্তু লালনের জীবন-সাধনা---জীবনের প্রবাহ রোধের নস্ট্যালজিয়া'য় আক্রান্ত; যদিও আধ্যাত্মিক অর্থে তার একটি ইতিবাচক দিক বিদ্যমান। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য রসময়, কিন্তু লালন-গীতি ধূসর। উভয়-কবির এ মানস-বৈপরীত্যের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়---পাশ্চাত্য কবি ওয়ার্ড্‌স ওয়ার্থের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন—

পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দ মদিরা ধারা নব নব স্রোতে।[৩৬]

সেখানে লালনের উক্তি—

যেমন নিকট থেকে দূরে দেখায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
দেখ না—
ফকীর লালন ম'ল জল পিপাসায় রে
কাছে থাকতে নদী মেঘনা॥

উভয় কবির সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের শ্রেণীগত বৈপরীত্যই এরূপ মানস-বিভিন্নতার কারণ। এজন্য সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত কবিদের মধ্যে সব থেকে বেশী লালন-প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও সব থেকে বেশী অ-লালনীয়।

৬ অন্যান্য শিক্ষিত কবি

অপরাপর শিক্ষিত কবির রচনায় লালন-গীতির সাধর্ম্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মসঙ্গীত' এবং সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সমাজ ও জাতি-ধর্ম-মানবপ্রীতি মূলক কোন কোন কবিতা এবং গানের সঙ্গে লালন-গীতির ভাবসাযুজ্য বিদ্যমান।

এঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে লালনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি লালনের দেহাকৃতির স্কেচ অংকন করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালন-গীতির রস-পিপাসুও ছিলেন। তিনি তাঁর 'ব্রহ্মসঙ্গীত' রচনার আদর্শের উল্লেখকালে বলেছেন—"কি সৌখিন, কি পেশাদার, কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া, আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতাম। এইরূপে ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে।"[৩৭] অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরচিত ব্রহ্মসঙ্গীতে যে লালন-গীতির স্বর, সুর ও তাল যথেষ্ট প্রবেশ করেছে, তা' তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম এরূপ সচেতন লালন-চর্চা করেননি। তথাপি সত্যেন্দ্রনাথের কতিপয় কবিতা এবং নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ ও 'জুলফিকার' গীতি-গ্রন্থের কোন কোন গানে

লালন-গীতির একান্ত সাদৃশ্য বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'হোম শিখা'র 'সাম্যসাম' ও নজরুল ইসলামের 'জাতের বজ্জাতি' এবং 'সাম্যবাদী' কবিতা নিচয়ের সঙ্গে লালনের 'জাতি'-বিচার বিষয়ক গান তুলনীয়। নজরুল ইসলামের "আহ্‌মদের ঐ সিমের পর্দা উঠিয়ে দেখ রে মন" গানটির সঙ্গেও লালনের "এই মানুষে আছে আমার রব্বানা" গানটির আশ্চর্য ভাব-সাদৃশ্য দৃশ্যমান। কিন্ত এসব সাধর্ম্য ব্যক্তিগত মানবিক অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে জাত বলেই মনে হয়।

সমকালীন লোক–কবিদের রচনায় লালন শাহের প্রভাব

'হিতকরী'—উল্লেখিত লালনের দশ হাজার শিষ্যের সকলেই কবি ছিলেন না। তাঁর প্রত্যক্ষ কবি-শিষ্যদেরও সবার সন্ধান আজ আর পাওয়া সম্ভব নয়। এসব কবি—সবাই স্বরচিত গানে গুরু হিসেবে লালনের নামোল্লেখ করতেন কিনা সন্দেহ। যাঁরা নিজেদের রচনায় গুরু–লালনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—তাঁদেরও সকলের পরিচয় পাওয়া কঠিন। অধুনা অতি নগণ্য সংখ্যক বাউল কবির রচনায় গুরু হিসেবে লালনের নাম ভণিতার সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। লালনের এরূপ প্রত্যক্ষ কতিপয় শিষ্যের উপর লালন-প্রতিভার প্রভাবের স্বরূপ নিম্নে আলোচিত হ'ল।

১ দুদ্দুশাহ্

দুধ্ মল্লিক বিশ্বাস[৩৮] ওর্ফে দুদ্দু শাহ্ ১২০৩ সালে[৩৯] যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমায় বেলতলা গ্রামে জন্মলাভ করেন।[৪০] বেলতলা লালন-জন্মভূমির পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম। দুদ্দুর বংশগত উপাধি মণ্ডল। কিন্তু তিনি, শিক্ষিত[৪১] ছিলেন ব'লে তাঁকে স্থানীয় রেওয়াজ অনুযায়ী 'বিশ্বাস' ব'লে নির্দেশ করা হ'ত। তিনি প্রথম জীবনে লালন-বিরোধী ছিলেন। তার পর তাঁর শিষ্যত্ব লাভের পর দুদ্দু শাহ্ নামে পরিচিত হন এবং স্ত্রী-পুত্র ও সংসারের সঙ্গে দৃশ্যতঃ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে সেঁউড়িয়া আখড়ায় লালনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বাকী জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করেন।[৪২] ফলে, লালনের প্রভাব দুদ্দু শার শুধু জীবন-সাধনায় নয়, সংগীত রচনায়ও অপরিসীম। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত অংশের উল্লেখ করা যায়ঃ

আল্লার নূরে নবীর জন্ম হয়
বল, নবীর আগে জন্ম কেবা পায়
সারাৎসার জানি
সাঁই কাদের গণি
দুদ্দু কয় লালন সাঁইর কৃপাতে ।।[৪৩]

আলোচ্য অংশ লালনের 'আছে দীন দুনিয়ায় অচীন মানুষ একজনা' গানের শেষাংশের ভাব সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উক্ত স্তবকে লালন বলেছেন—

কেউ তারে জেনেছে দড়
সে খোদার ছোট নবীর বড়
ফকীর লালন বলে নড়চড়
সে বিনে কূল পাবে না।

এছাড়া, সাধক-সাধিকার সম্পর্ক নির্ণয় বিষয়ক একটি গানে দুদ্দু শাহ্ বলেছেন——

ভেক ফণীতে করে যাজন
ভেকের বাটে ফণীর বদন
অমৃত রস পানে দুইজন
প্রেমেতে হয় মগন ।।

শুনতে লাগে বিষম ত্রাস
ভেক ফণীতে করে বিলাস
লালন সাঁই কয় রসিক নির্যাস
গরল খেয়ে দুদ্দুর মরণ ।।[৪৪]

দুদ্দু আলোচ্য গানে সাধক-সাধিকার সম্পর্ককে ভেক ও সর্পের প্রীতি-ময় সম্বন্ধের উপমা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর এ গানের বক্তব্যের সঙ্গে লালনের "সামান্য জ্ঞানে মন কি তাই পারবি রে" গানটির ভাব-সামীপ্য স্পষ্ট। যথা,—

সামান্য জ্ঞানে মন কি তাই পারবি রে
বিষ সুধা করিয়ে জুদা রসিক জনা পান করে ।।
... ...

অহি মণ্ডুক উভয় যদি
হিংসা ছেড়ে হয় পীরিতি
ফকীর লালন বলে অমৃত নিধি
সুধা সেধে অমরি রে॥

উভয় গানেই ভেক-ফণীর সম্পর্ক ও সুধা-গরল রূপক প্রয়োগে অভিন্ন বক্তব্য উপস্থাপিত। দুদ্দু শা'-র রচনায় লালন-গীতির এ থেকেও গভীরতর প্রভাবের নিদর্শন বর্তমান। যথ,—

(ক) বিনা মেঘে নীর বরিষণ কালাকাল নাই।
তাই সেই নুরের ভাণ্ড শূন্যাকারে রয়॥[৪৫]···ইত্যাদি

তুলনীয় লালন—

বিনা মেঘে বর্ষে বারি
শুদ্ধ শান্ত রসিক হ'লে
মর্ম জানে তারি।
তার নাই কালাকাল
সকাল বৈকাল
অবধারি॥

(খ) দুদ্দু শাহ্—

আল্লার নুরে যে নবী হয়
ছারে জাহান তাহার নুরে কয়
হায়াতুল মূর্সালীন সে হয়
জিন্দা চার যুগের উপর॥[৪৬]

তুলনীয় লালন—

যে নবী পারের কাণ্ডার
জিন্দা সে চার যুগের উপর
হায়াতুল মূর্সালীন নাম তার
হয় সেই জন্যে॥

এছাড়া দুদ্দু শা'র গানের উপর লালন-গীতির গভীরতর প্রভাবের আরও নিদর্শন বিদ্যমান। এমন কি বেশ কিছু সংখ্যক গান লালন-দুদ্দু উভয়ের ভণিতাতেই পাওয়া গিয়েছে।[৪৭] সে সব গানের কোন্‌টি কার রচনা সঠিক রূপে তা' নিরূপণ করা কঠিন।

অবশ্য সংগীত রচনার ক্ষেত্রে দুদ্দু অপেক্ষা লালন অধিক রহস্য-ময় (Mystic) কবি। তিনি সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলেননি। তাঁর গান অর্ধোচ্চারিত, ইঙ্গিতাত্মক ও বাক্যদীপ্ত। কিন্তু দুদ্দু প্রাঞ্জল ভাষার কবি। বাউল পরিভাষার ব্যবহার ও তার ব্যাখ্যায়—তিনি একাধারে কবি ও টীকাকার দুই-ই। লালন সহজ শব্দ চয়নে গীত-রচনায় সিদ্ধ সাধক তথাপি দুদ্দু তাঁর গানের ভাষাকে বলেছেন 'কঠিন'। পক্ষান্তরে নিজের গানের ভাষাকে বলেছেন—'চলিত ভাষা' বা সহজ ভাষা।[৪৮] যদিও দুদ্দু নিজে লালনের তুলনায় অধিক তৎসম ও তদ্ভব শব্দ-সম্পাতি কবি!

'ভাষা' অর্থে যদি শব্দ মাত্র না বুঝিয়ে শব্দ সহযোগে বাক্যে যে দীপ্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়, তা' বোঝায়—তাহলে, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, লালন অপেক্ষা দুদ্দু অধিকতর সহজ ভাষার কবি।

দুদ্দু শাহ্ লালনের 'মানুষ-তত্ত্ব' প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার উৎস এবং ইতিহাস নির্দেশও তাঁরই কৃতিত্ব। এজন্য বলা অসমীচীন নয় যে, দুদ্দু শা'-র অভাবে লালনের সাধন-তত্ত্ব হয়তো কোনকালেই সম্পূর্ণ বোঝা যেতনা। বাউল হ'য়েও তিনি যে সুগোপন বাউল-তত্ত্ব-উপলব্ধির কুঞ্জী তার বাউল গানের মাধ্যমে স্পষ্ট রূপে হস্তান্তর করে গেছেন এজন্য বাউল তত্ত্ব রসিকগণ নিশ্চিতরূপেই তার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। কিন্তু লালন-জীবনী ও লালনীয় বাউল-তত্ত্বের সন্ধানদাতা হিসেবে দুদ্দু যতটা স্মরণীয়, কবি হিসেবেও তার থেকে কম আদরণীয় নন।

বস্তুতঃ লালনের প্রত্যক্ষ প্রিয় শিষ্য হিসাবে দুদ্দু শা' বাউল কবিদের মধ্যে সর্বাধিক লালন-প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও কবি ও তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা—এ দু'রূপেই তনি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর উপর লালনের প্রভাব যেমন কম নয়, তেমনি কবি হিসেবে দুদ্দুর স্বাতন্ত্র্যও উপেক্ষণীয় নয়।

২ কিনু শাহ্

লালন-শিষ্য বাউল-কবিদের মধ্যে কিনু ফকীরের নাম উল্লেখ-যোগ্য। কিনু শা'-র সঠিক পরিচয় জানা যায় না। তাঁর কোন কোন গানের ভণিতায় গুরু হিসেবে লালন শাহ্ ও ফটিক চাঁদের নামোল্লেখ দেখা যায়। তবে লালনকেই তিনি সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক গানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন কিনু সাঁইয়ের যে সব গান সংগ্রহ করেছেন---তা' তাঁর গ্রন্থে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে----লালন-গীতি নামে নির্দেশিত।[৪৯] মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এসব গানের ভণিতা বিচারে ভুল করেছেন এবং ভাবে, ভাষায় ও প্রকাশ ভঙ্গিতে গানগুলো লালন-গীতির কাব্য-বিভায় এত আলোচিত যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা----তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কিনু শা-র গান পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় কিনু-গীতিতে লালন-গীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব অকুণ্ঠ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আত্ম-জ্ঞান লাভের জন্য কিনু বলেছেন---

আগে জান হাওয়ার স্থিতি।
কোথায় হাওয়ার উৎপত্তি
কোথায় হাওয়ার গতাগতি ॥[৫০]

এর সঙ্গে লালনের নিম্নোক্ত কবিতাংশের অভিন্নতা লক্ষণীয়:

আগে কর হাওয়ার মূল ঠিকানা
অনায়াসে দেখতে পাবি
কোথায় রে কার বারাম খানা।

এখানে 'হাওয়ার ঠিকানা' করার অর্থ যোগসাধনায় রত হওয়া। উভয় কবি প্রায় একই ভাষায় সে-কথা বলেছেন।

মানব-জীবনের অনিত্যতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে কিনুর উক্তি----

আমার মন রে দিন থাকিতে
মানুষ চিনে ধরো।...
... ...

লালন সা দরবেশে বলে
কিনু রে বাপ আয় সকালে
এই মানব জনম যায় বিফলে
বইসে বা কি করো।[৫১]

এর সঙ্গে লালনের নিম্নোক্ত গানের ভাব-সামীপ্য লক্ষণীয়:

এমন মানব জনম আর কি হবে?
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে॥
... ...
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছ এই মানব তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী সুধারায়
যেন ভরা না ডোবে॥

অনুরূপ সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত আরও বিদ্যমান। উদাহরণতঃ শুদ্ধ প্রেমের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে কিনু শাহ্ একটি গানের শেষ স্তবকে বলেছেন—

দরবেশ লালন শা' তাই কয়
ও কিনু প্রেম সামান্য নয়
সে প্রেম করতে পারলে
একই কালে
পিতলে সোনা ফলে॥[৫২]

অনুরূপ বক্তব্য লালন-গীতিতেও লভ্য। লালনও শুদ্ধ প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় বলেছেন----

রূপ সনাতন ভাই রে দু'জন
হরিভক্ত প্রেম মহাজন
অধীন লালন বলে
প্রেম করিলে
পিতলে সোনা ফলে॥

লক্ষণীয় যে, লালন-গীতির একটি পূর্ণ পংক্তি অবিকৃতভাবে কিনু-গীতিতে গৃহীত হয়েছে।

তাছাড়া কিনু শা'র "আয় কে যাবি বড়্শী বাইতে নূতন পুকুরে" গানটির সঙ্গে লালনের "ওমন ঝাঁপ দিয়ে ক্যান্ পড়লি রে তোর বাপের পুকুরে" গানের সাদৃশ্য প্রকট।

এরূপ অনেক কিনু-গীতিতে লালন-গীতির শব্দ, বাক্য, রূপক-উপমা ও পংক্তির সাঙ্গীকরণ বর্তমান।

তথাপি কবি হিসেবে কিনু স্বল্প-শক্তি নন। তাঁর সংগৃহীত অধিকাংশ গান জনমুখে বিকৃতি লাভ করেছে। তাঁর অবিকৃত রচনার প্রতি দৃকপাত করলে দেখা যায়, স্থানে স্থানে কিনুর কাব্য-প্রতিভার স্পষ্ট স্বাক্ষর দীপ্যমান।

৩ পাঁচু শাহ্

লালন-শিষ্য বাউল কবিদের মধ্যে পাঁচু শাহ্ অন্যতম। বাউল কবি হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতিমান। পাঁচু শা' কুষ্টিয়া জেলার উজান গ্রাম ইউনিয়নের সোনাই ডাঙ্গা গ্রামের সন্তান। তিনি ধনবান ও শিক্ষিত ছিলেন।

ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, আবুল আহসান চৌধুরী ও আমার নিজের সংগৃহীত পাঁচু গীতির অধিকাংশে, পাঁচু, গুরু হিসেবে লালনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

লালনের প্রত্যক্ষ শিষ্যরূপে পাঁচুর জীবনে ও গানে গুরুর প্রভাব বিপুল। উভয় কবির রচনা তুলনা করলে দেখা যায়, পাঁচু ক্ষেত্র-বিশেষে শুধু বক্তব্যের অভিন্নতায় নয়, ভাব-রূপায়ণের কলা-কৌশল এবং রূপক-উপমা চয়নের ক্ষেত্রেও লালনের নিকট বিশেষভাবে ঋণী' উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি লক্ষণীয়:

১ ক, পাঁচু-গীতি—

আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায়রে
ওসে ধারার সঙ্গে আছে মানুষ ধর সে ধারায় রে।।...

তিন শ' ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি;
সেই নদীতে ফাঁদ পাতিলে (প্রাণ বান্ধিলে)
মানুষ ধরা যায় রে।।[৫৩]

তুলনীয়, খ, লালন-গীতি---

সোনার মানুষ ভাসছে রসে।
যে জানে সে রস-পান্থী
দেখতে পায় সে অনায়াসে।।

তিন শ' ষাইট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি'
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।।...

২ ক, পাঁচু-গীতি----

দরবেশ লালন সাঁই তাই
পাঁচু বলে রে তোমায়
বৈদিক বাণে করিস নে রণ
হারাবি তুই পিতৃধন।।[৫৪]

তুলনীয়, খ, লালন-গীতি—

লালন সাঁই দরবেশের বচন
বৈদিক বাণে করিসনে রণ
বাণ হারালে পড়বি তখন
রণ খোলাতে হুবড়ি খেয়ে।।

এরূপ আরও উদ্ধৃতির সাহায্যে পাঁচু-গীতির উপর লালন-গীতির অবিসংবাদিত প্রভাব দেখানো যায়। সেজন্য লালন শাহের বক্তব্য, প্রকাশ-ভঙ্গি ও মানস-ধর্মগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ছাড়াও—শব্দ, বাক্য, পদ ও পংক্তি এবং রূপক-উপমার স্বাঙ্গীকরণও পাঁচুর অধিকাংশ গানে স্পষ্ট। তথাপি কবি হিসেবে তিনি অপাংক্তেয় নন।

৪ গগন হরকরা

গগন হরকরা শিলাইদহের নিকটবর্তী আড়পাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[৫৫] কিন্তু মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন লিখেছেন---তাঁর বাড়ী ছিল খোরশেদপুর।[৫৬] বিশ শতকের প্রথম দশকে তাঁর জন্ম হয়। তিনি লালনের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন কি না নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় লিখেছেন--"গগন ফকীর লালনের শিষ্যধারার-ই একজন।"[৫৭] ক্ষিতিমোহন সেনও গগনকে লালন-শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৮] কিন্তু অধুনা দুষ্প্রাপ্য গগনের যে তিন-চারটি গান মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়, তার কোনটিতেই গুরুর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

এ সামান্য সংখ্যক গানের ভিত্তিতে গগনের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় অবিধেয়। এজন্য তাঁর জবীনে ও রচনায় লালন-প্রভাবের স্বরূপ নিরূপণ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা বাচন থেকে গগনের কবি-প্রতিভার মহত্ব কিছুটা ধারণা করা যায়।[৫৯] তিনি তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রথম বক্তৃতায় গগনের "আমি কোথায় পাবো তারে", "তোরই ভিতর অতল সাগর" এবং "মনের মধ্যে মনের মানুষ কর অন্বেষণ" গীতিত্রয় থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং গগনের তত্ত্ব-চেতনার বিশেষ প্রশংসা করেছেন।[৬০] প্রকৃতপক্ষে, গগন লালন-শিষ্যদের মধ্যে একজন ভাল বাউল কবি ছিলেন।

৫ কুবীর গোসাঁই

লালন শা'র বিপুল শিষ্যের মধ্যে কুবীর গোসাঁই বিশেষ বিখ্যাত। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, তাঁর বাসস্থান ময়মনসিংহে বলে লোক-শ্রুতির উল্লেখ করেছেন।[৬১] কিন্তু কুবীর গোসাঁই ময়মনসিংহের অধিবাসী নন। বাঁকুড়াতে উনিশ শতকের মধ্যভাগে তাঁর জন্ম। তিনি প্রথম চরণ গোসাঁই-এর শিষ্য হন। পরবর্তীকাল লালন তাঁকে স্বমতে দীক্ষা দেন।

মনসুর উদ্দীন লিখেছেন---"লালন ফকীরের গানে তাঁর নামোল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।"[৬২] এ উক্তি সঠিক নয়। কারণ ওই গানগুলো প্রকৃত পক্ষে লালনের নয়, কুবীরের রচনা। কুবীর লালনের প্রত্যক্ষ শিষ্য হওয়ায় স্বরচিত বহু গানে তিনি গুরু লালন শাহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

করেছেন। কিন্তু ভণিতা বিচারে ভুল হওয়ায় মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এ সব গান লালন-বিরচিত ব'লে চিহ্নিত করেছেন।

উভয় কবির গান তুলনা করলে দেখা যায়, কুবীর-গীতির উপর লালন-গীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব সুচিহ্নিত। বিশেষতঃ রূপক-উপমা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে লালন ও কুবীর-গীতির সাদৃশ্য নিকটতর। উদাহরণতঃ বলা যায়, 'মানুষ-তত্ত্ব' ব্যাখ্যায় কুবীর বলেছেন—

এই মানুষকে করবে বিশ্বাস
এই মানুষ জানিও সত্য নির্যাস
এই মানুষ বিনা হবে নাকো
সেই সহজ মানুষের করণ॥[৬৩]

লালন-গীতি ভেঙেই যে এ গানের সৃষ্টি তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

মানুষে মানুষ কামনা সিদ্ধ করো বর্তমানে
খেলছেন খেলা বিনোদ কালা
এই মানুষের তন ভুবনে॥
মানুষে যার আছে বিশ্বাস
সেই দেখিতে পাবে নির্যাস বর্তমানে।
চৌদ্দ ভুবন ফিরায় নয়ন
ঝলক দিচ্ছে নয়ন কোণে॥

শুধু তত্ত্ব-চিন্তা নয়, কাব্য-ভাবনা বিশেষতঃ উপমা-চয়নের ক্ষেত্রেও কুবীরের উপর লালনের প্রভাব অসামান্য। যথা—

১ ক, কুবীর-গীতি—

কালো মানিক ঢাকা আছে
নির্মল বায় রূপে।
যেমন সৌদামিনী দীপ্ত করে
প্রেমের সুআলাপে॥[৬৪]

তুলনীয়, খ লালন-গীতি—

মনের মানুষ খেলছে দ্বি দলে।
যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে॥

২ ক, কুবীর-গীতি—

গাধা পিটলে হয় কি ঘোড়া
ঘোড়া কভু হয় কি ভেড়া
শালগ্রাম হয় কি নোড়া
থাকলে হেঁসেলের কোণে॥[৬৫]

তুলনীয়, খ, লালন-গীতি----

মানুষের বীজে হয় না ঘোড়া
ঘোড়ার বীজে হয় না ভেড়া
যে বীজ সে গাছ জগৎ জোড়া
দেখ্‌রে দুই নয়নে॥

লালন শা-র বাগ্‌ভঙ্গির এ অনুকরণ কুবীর সাঁইয়ের আরও গানে বিদ্যমান।

কবি হিসেবে কুবীর গোসাঁই লালন-প্রতিভাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হননি। তবে লালনের ভাব-চৈতন্যকে যে তিনি আত্মগত করতে পেরেছেন, এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। ভাব, ভাষা, ছন্দ ও বাণী-বিন্যাসে কুবীরের উপর লালনের গভীরতর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিজস্বতা দুর্লক্ষ নয়। তিনি লালন-গীতির মতই ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চাঙ্গের ও উৎকৃষ্ট কাব্য-শিল্প স্রষ্টা। লালন-গীতির সুভাষণের ন্যায় কুবীর-গীতিতেও প্রচুর সুভাষণ লক্ষণীয়। যথা,----

১ পরের ধন কি হয় কাঁচের কোণ।
২ হয় কি তাতে অপমান
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ভানে ধান।
৩ আমার কপালেরি ফের
চিঁড়ের বাইশ ফের।··· ইত্যাদি

এসব ক্ষেত্রেই পদকর্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও কবিত্ব শক্তি সুচিহ্নিত ঃ

৬ অন্যান্য লোক-কবি

লালনের প্রত্যক্ষ কবি-শিষ্যদের মধ্যে অন্য কারো নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁর সমকালীন বাউল হাউড়ে গোসাঁই, পাঞ্জু শা, জহর শা', উজল শা', যাদুবিন্দু (লালন-প্রশিষ্য), কাজেম শা' প্রভৃতির রচনায় ও কবি-শ্রেষ্ঠ বাউল ফকীর লালন শা'র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই স্বীয় সম্প্রদায়ের শিষ্য-প্রশিষ্যদের রচনায় তো বটেই, তাছাড়াও—সমকালীন এবং পরবর্তীকালের অন্যান্য বাউল কবির রচনায় লালন-প্রতিভার মায়াবি আকর্ষণ অদ্যাপি অব্যাহত। এখনও পর্যন্ত বাউল-গীতি ধারায় লালন-গীতিই বাউল গানের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এবং অনুকৃতির আদর্শ—আকর।

তথ্যনির্দেশ

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, নং ১০, (ঈশ্বর গুপ্ত, ৪র্থ মুদ্রণ, কলি, ১০৫২), পৃ. ৮

২ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা-সংগ্রহ (মাওলা ব্রাদার্স-প্রকাশিত, ঢাকা, ১৩৭৬), পৃ. ৫৬ তত্ত্ব চিন্তা: "দেহ-ঘর"।

৩ দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০, ঐ, "সার-উপদেশ"।

৪ দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬ বিবিধ, "মন-মিশনরি"।

৫ দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯, গীতাবলী, (আড়ানা—আড়া)।

৬ দ্রষ্টব্য, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, বিহারীলাল রচনা-সম্ভার, (মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, কলি, ১৩৬৮), পৃ. ॥. ভূমিকা।

৭ প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫, গান-সংখ্যা ১৫

৮ প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

৯ জলধর সেন, কাঙ্গাল হরিনাথ—১ম খণ্ড (নামপত্র ছিন্ন), পৃ. ২, "জীবন কথা"।

১০ দ্রষ্টব্য, এস. এম. লুৎফর রহমান, লা. শা. জী. ক., পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০। "ছেউড়িয়ায় আগমন।"

১১ ক্ষিতিমোহন সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১২ দ্রষ্টব্য, জলধর সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-৩৫ "ফিকির চাঁদের" বাউল সংগীত।

১৩ বসন্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৪, "জীবন-কথা" দ্রষ্টব্য।

১৪ মুনীর চৌধুরী, মীর-মানস (বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা—১৩৭১) পৃ. ৪

১৫ দ্রষ্টব্য, জলধর সেন, কাঙ্গাল হরিনাথ—২য় খণ্ড (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স প্রকাশিত, কলি, ১৩২১) পৃ. ২৪-২৫

১৬ উদ্ধৃত, জলধর সেন, কা. হ. দ্বি. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ৭ ব্রহ্মাণ্ড-বেদ।

১৭ দ্রষ্টব্য, জলধর সেন-উদ্ধৃত, কা. হ. দ্বি. খ. পূর্বোক্ত পৃ. ৮ ব্রহ্মাণ্ড-বেদ।

১৮ দ্রষ্টব্য, জলধর সেন, কা. হ. দ্বি. খ., পূর্বোক্ত, সমগ্র গ্রন্থ।

১৯ উদ্ধৃত, জলধর সেন, কা. হ. প্র. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০-৪১। "ফিকির চাঁদের বাউল সংগীত।"

২০ দ্রষ্টব্য, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত মশাররফ রচনা-সম্ভার, (বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৮০), পৃ. ৬৭০, গান সংখ্যা ৮৯

২১ দ্রষ্টব্য, এস. এম. লুৎফর রহমান, বা. ক. লা. শা. প্র., পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

২২ ক্ষিতিমোহন সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীত-বিতান (বিশ্বভারতী প্রকাশিত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ নূতন সংস্করণ, কলি, ১৩৬৭), পৃ. ৮৪১

২৪ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

২৫ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪০, "পূজা ও প্রার্থনা"

২৬ উত্তরা দেবী গীত এই গানটি আকাশ-বাণী, কলিকাতা-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত। গানটি গীত-বিতানে নেই।

২৭ দ্রষ্টব্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, (নাম পত্র ছিন্ন), পৃ. ১০০। পরিশিষ্টে যোজিত "রবীন্দ্র-পত্রমালা", ৪ নং পত্র ।

২৮ দ্রষ্টব্য, (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্র রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, (বিশ্ব ভারতী প্রকাশিত, পুনর্মুদ্রণ, কলি, ১৩৬১), পৃ. ৪৩০

খ) Rabindranath Tagore, Creative Unity (Indian Edition, Macmillan and Co. Ltd, Reprinted, London–1925), PP. 70–83, "An Indian Folk Religion."

২৯ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, র. র., পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

৩০ জসীম উদ্দীন, কবি রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভা, দৈনিক ইত্তেফাক রবিবাসরীয় সংখ্যা, জানুয়ারী ৮, ১৯৬১

৩১ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ষ্টেটে'র কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে লালন-শিষ্য ভোলাই সা'র নিকট থেকে লালনের গানের খাতা সংগ্রহ করেন। সে খাতা এখনও শান্তি-নিকেতনে রক্ষিত আছে।

৩২ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লালন ফকিরের গান', প্রবাসী (আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ—১৩২২), পৃষ্ঠা যথাক্রমে ২৯৩-৯৪, ৪০৪-০৫। "হারামণি" বিভাগ।

৩৩ দ্রষ্টব্য (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবন-স্মৃতি (বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, কলি, ১৩৫০), পৃ. ১০০। গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

খ) Rabindranath Tagore, C. U., Ibid, Page 70-83

৩৪ রবীন্দ্রনাথের 'বলাকার ছন্দ' (মুক্তক) মূলতঃ রবীন্দ্র-নির্দেশিত লালন-গীতির-ই ছন্দ। দ্র. ৩৬০ পৃষ্ঠা।

৩৫ দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হারামণি, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৩৭৩) রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ।

৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩। "বসুন্ধরা"।

৩৭ উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক চরিত মালা, ষষ্ঠ খণ্ড, (ব. সা. প., সং, কলি, ১৩৫৪) পৃ. ২০। "জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর।"

৩৮ এ নাম সরকার রেকর্ডে দেখা যায়। দ্রষ্টব্য, মৌজা হরিশপুর, পরগণা মোহাম্মদ সাহী, রে. সা. ৩৮., তৌজি নং ১৭৮, খতিয়ান—৮৭৭।

৩৯ দ্রষ্টব্য, শাহ্ লতীফ আফী আনহু, বাউল কবি দুদ্দু শাহ্, সমকাল (চৈত্র—১৩৬৬), পৃ. ৬০৩

৪০ দুদ্দু শাহ্, লালন-জীবনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫। লালন-জীবনী প্রসঙ্গে আত্মপরিচয়।

দ্রষ্টব্য, শাহ্ লতীফ আফী আনহু, বা. ক. দু. শা., পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৩।

৪২ এ সম্পর্কে দুদ্দু শা'র উক্তি—

"দিন গেছে সাঁইর কদমে
সেঁউড়িয়ায় জেলের গ্রামে
জাত গেছে তোড়ানীর ঘামে
পেয়েছি রতন ॥"

দ্রষ্টব্য, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩। গান সং-৫

৪৩ স্বসংগৃহীত। এ গানটি বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থেও বিদ্যমান, দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯৩-৯৪। গান নং ১৭৯। গানটির শেষ স্তবক উদ্ধৃত।

৪৪ স্ব-সংগৃহীত।

৪৫ দ্রষ্টব্য, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১। গান সংখ্যা ১৭৫।

৪৬ স্বসংগৃহীত। গানটি 'বাউল কবি দুদ্দু শাহ্' গ্রন্থেও দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮৬। গান সংখ্যা ১৬৮।

৪৭ দ্রষ্টব্য, (ক) খোন্দকার রফিউদ্দীন, ভাব-সঙ্গীত (কালাই তালুকদার প্রকাশিত, কুষ্টিয়া—১৩৬৪), পৃ. ২০০-০১, গান সংখ্যা ৩১। প্রথম চরণ—"মর জিন্দেগীর আগে।"

এবং (খ) এস. এম. লুৎফর রহমান, লা. শা. জী. ক., পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭। ধর্মমত সম্পর্কীয় আলোচনায় উদ্ধৃত পাঠ।

৪৮ এ সম্পর্কে দুদ্দু বলেছেন—

"যে আদেশ পেয়েছিলাম
সেই মত লিখে গেলাম
জেনে খাতায় সই করিলাম
তাই রে ভাই এবার॥

লালন সাঁই'র চরণ ভরসা
দুদ্দু লেখে খোলাসা
কঠিন ছিল সব ভাষা
চলিত ভাষায় প্রকাশ তার। স্ব-সংগৃহীত

৪৯ দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত, হা. ম. প. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০, ৯৭, ১১১ ইত্যাদি। গান সংখ্যা ৫৩০, ১৬৬, ১৯২ ইত্যাদি।

৫০ দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত, হা. ম. প. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ১১। গান সংখ্যা ১৪।

৫১ মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত, হা. ম. প. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ১২। গান সংখ্যা ৬

৫২ মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত, বা. ম., প. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪। গান সংখ্যা ৭১।

৫৩ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৯। গান সংখ্যা ২৩৮।

৫৪ আবুল আহ্সান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫। গান সংখ্যা—৪।

৫৫ আবুল আহ্সান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫। গগন হরকরা।

৫৬ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হা. ম. স. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫। ভূমিকা।

৫৭ সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, নদীয়ার লোক-সংস্কৃতি, দেশ (সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭২), পৃ. ১৫৮

৫৮ ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৫৯ See, Rabindranath Tagore, C. U., Ibid, P. 79

৬০ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, র. র., বি. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯০, "মানুষের ধর্ম"।

৬১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হা. ম., প. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ২।/ ভূমিকা।

৬২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হা. ম., প. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ২॥ ভূমিকা।

৬৩ দ্রষ্টব্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭৪। গান সংখ্যা ৪৬৬।

৬৪ স্ব-সংগৃহীত।

৬৫ স্ব-সংগৃহীত।